MANIKCHAK COLLEGE

UNDER(UGB)

ESTD:-2014

DEPT. OF HISTORY

SEMESTER-VI(GENERAL)

COURSE TYPE-604

CORSE TITLE-PROJECT

NAME OF THE PROJECT- বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন

PROJECT SUBMITTED BY:-

NAME:-SADHAN MANDAL

REGISTRATION NO:-511-1112-1976-19

ROLL:-5119GENA NO:-1599

SESSION:-2019-2020

H.O.D
HISTORY

14.05.22

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Project টি তৈরী করতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সাহায্য ও নিরন্তর উৎসাহদানের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের বিভাগীয় প্রধান মাননীয় শ্রী বিজন সরকার মহাশয়ের নিরন্তর সাহায্য ও অনুপ্রেরনা আমাকে সর্বিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছে। আমাদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মাননীয় শ্রী রঞ্জন কুমার মন্ডল মহাশয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এনারা দুজনেই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আলোচনা ও সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী- অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয়ের সর্বিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কলেজের অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকেরা আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কলেজের সমস্ত শিক্ষাকর্মীরাও যথাযথ সাহায্য করেছেন। এই কাজ। তবে যে কথা উল্লেখ না করলে আমার এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ন থাকবে তা হলো কলেজ গ্রন্থাগারের কথা। গ্রন্থাগারের আধিকারিক মহাশয় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যাবলী- সরবরাহ করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানে যদি কোন অসংগতি বা ত্রুটি থেকে যায় তাহলে তার দায় ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ন আমার।

বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন

ভূমিকা :- প্রচলিত অর্থে একজন সাধারন সংস্কৃত পন্ডিত হয়েও সমাজ-সচেতন ও মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) খ্রী: ছিলেন বঙ্গীয় নবজাগরনের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। উনিশ শতকের ধর্মীয় বিবাদ-বিসংবাদের দিনে 'করুনাসাগর' বিদ্যাসাগর বুদ্ধদেবের মতোই ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামান নি মানুষই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য, আর এই মানুষের মুক্তির জন্যই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে যান। ধুতি-চাদরের ভূষিত, তালতলার চটি-পরিহিত, উন্নত-শির দৃঢ়চেতা প্রাচ্যের মানবতাবোধ এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। চিরাচরিত রক্ষণশীল পরিবেশে লালিত এবং সংস্কৃত পন্ডিত হয়েও ইংরেজি শিক্ষাও সভ্যতাকে তিনি সাদরে বরন করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মতে এই ভীরুর দেশে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষসিংহ। তাঁর মতে ' দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব '। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মাঝে দেখেছিলেন এমন এক মানুষ " যাঁর মনীষা প্রাচীন ঋষিদের মতো, কর্মদক্ষতা ইংরেজের মতো এবং হৃদয়বত্তা বাঙালী জননীর মতো।" ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁকে " একজন ঐতিহ্যবাদী-আধুনিকতাবাদের প্রবক্তা (A traditional Moderniser) বলে অভিহিত করেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন

'বিদ্যাসাগর' কে ছিলেন হয়তো কেউ জানে, কেউ জানে না। আজ থেকে প্রায় একশো বিশ বছর আগে ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। আজকের পাঠ্যপুস্তক বা সাহিত্য-আলোচনায় তেমন করে বিদ্যাসাগরকে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর তাঁর নাম নয়, এটি তাঁর উপাধি। যথার্থই তিনি বিদ্যার এবং করুণার সিন্ধু বটে। মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রাম। সে গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প বেতনের চাকরি করতেন কলকাতায়। এই পরিবার ছিল না শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ। অন্দরে মেয়েলি কলহ, অগ্রজে-অনুজে অবজ্ঞা, অভাব-অনটন এরই মধ্যে জন্ম নিলেন একটি 'এঁড়ে বাছুর' (পিতামহের পরিহাস সূচক সম্বোধন)। পিতামহের পরিহাস মিথ্যে হয় নি, সত্যিই তিনি এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে স্বভাবের ছিলেন। এই জেদী মনোভাব তাঁকে একসময় স্থির প্রতিজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তে অটল করেছে।

শিশু-ঈশ্বর বাবাকে মোটেই যে মানতেন না, বরং বাবা যা বলতেন ঠিক তার উল্টোটি করতেন। বাবা যদি বলতেন ঈশ্বর স্নান করো, সাথে সাথে ঈশ্বর স্নান করবো না বলে জেদ ধরতেন। তাই বাবা এক নতুন ফন্দি আঁটলেন। বাবা বললেন ঈশ্বর আজ পড়া নয়, শুধু খেলা। অমনি ছেলে খেলা ছেড়ে বসে গেল পড়তে। শুধু তাই কী। গ্রামের নামকরা অনাসিষ্টি ঈশ্বর। পাঠশালায় যাবার পথে লোকের ধানক্ষেতে যবক্ষেতে ইচ্ছে মতো মাড়িয়ে দিতেন। ধানের ছড়া ছিঁড়তেন, চুষতেন। তাঁর দস্যিপনার সহচর ছিল গ্রামের কিছু সমবয়সী ছেলের দল। দুরন্ত আর অবাধ্য বালক ঈশ্বর গুরুমশাইয়ের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন, কারণ ঈশ্বর আর যাই করুক পাঠে খুব মনোযোগী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। দুই বছরের পাঠ মাত্র তিন বছরেই শেষ করে ফেললেন। গুরুমশায় তাঁর পিতাকে ডেকে বললেন, ওকে কলকাতায় পড়ালে ভালো হতো

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন

১৮২০ খ্রি: ২৬ সে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার (তৎকালীন হুগলি জেলা) বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং মাতা ভগবতী ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা নারী। আত্মবিশ্বাস ও তেজস্বিতার মূর্ত প্রতীক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাঁর দরিদ্র পিতা ও মাতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিনয় ঘোষ লিখেছেন – "মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে চেতনাময়! পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তাঁর 'টিচার' ও 'প্রিচার'।" জীবনের কঠিনতম সংকটের দিনগুলোয় সেই মা-ই ছিলেন তাঁর একমাত্র পরামর্শদাতা। আজীবিত মা বলতেন "ন্যায় ও সত্যের সাথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যা ভালো মনে করবি, তাই করবি বাবা! তার চেয়ে বড় ধর্ম কিছুই নেই।" গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়ার পাঠ সাঙ্গ করে মেধাবী বালক ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র পিতার হাত ধরে নদ-নদী পেরিয়ে পদব্রজে উপস্থিত হলেন নবজাগরণের রাজধানী শহর কলকাতায়। ১৮২৯ খ্রি: ১লা জুন তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৩৯ খ্রি: তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। এরপর ১৮৪১ খ্রী: শিক্ষা-জীবন শেষ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত এর পদে যোগদান করেন। ১৮৫০ খ্রী: ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক এবং পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন (২২ সে জানুয়ারি ১৮৫১) ১৮৫৮ খ্রি: ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আট বছর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

■ বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার :-

জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাই অন্ধকার দূর করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পৌঁছে দেয়। এক চিঠিতে তিনি লেখেন যে, "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।" লর্ড হার্ডিঞ্জের সহযোগিতায় তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে গ্রামাঞ্চলে বহু বাংলা মাধ্যম স্কুল স্থাপন করেন। এগুলির মধ্যে ৩৩ টি স্থায়ী হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি ২০টি মডেল স্কুল বা আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে অনেকগুলোই তিনি নিজ ব্যয়ে চালাতেন। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই প্রয়াস সফল হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের অভ্যন্তরেই তিনি একটি 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন বাচস্পতির উপর। আধুনিকতার জাগ্রত প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা ব্যতীত নারীসমাজের মুক্তি নেই। চিরাচরিত কুসংস্কারকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। ১৮৪৯ খ্রী: ড্রিংকওয়াটার বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে 'বেথুন স্কুল') প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ খ্রী: বিদ্যাসাগর এই শিক্ষায়তনের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলিতে প্রায় ১৩০০ ছাত্রী পড়াশুনা করত। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, শহরে নয় - বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। কারণ তখনও গ্রামেই কুসংস্কারের কেন্দ্র ছিল। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৬) বিধবাবিবাহ আন্দোলন ঃ

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় সংস্কারকেরা বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েছিল তবে খুব বেশি বিধবাবিবাহ এই আইন অনুসারে হয়নি। সমাজ রক্ষণশীল শক্তি এত প্রভাবশীল ছিল যে এই আন্দোলন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, শিক্ষিত মহিলা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংস্কারকেরা এই আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিশু বিবাহ ও বহু বিবাহ উচ্ছেদ ইত্যাদি দাবি করেছিল। ভারতের সদ্যজাত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কালক্রমে বিধবাবিবাহ আন্দোলন বৃহত্তর নারী মুক্তি আন্দোলনে পরিনতি লাভ করেছিল। সামাজিক এই সংস্কার আন্দোলনের ঔপনিবেশিক সরকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু রক্ষণশীলদের বিরোধিতা নয়. ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের পর সরকারি উদাসীনতা। ১৮৫৭ খ্রীঃ পর সরকার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। বিধবাবিবাহ আইনটি বিদ্রোহীদের অসন্তোষের একটি কারণ ছিল, এরপর সরকার শিশুবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধক আইনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে ভারতীয় সংস্কারকেরা এতে পিছু হটেনি। নারী জাতির মুক্তির আন্দোলন চলতে থাকে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে গান্ধিজী এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বস্ব দান করেন। তিনি নিজে বহু বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছিলেন এবং নিজপুত্র নারায়নচন্দ্রের সাথে এক বিধবার বিবাহ দেন। বিদ্যাসাগরের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাতে প্রার্থনাসমাজ এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে ব্রাহ্মরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

(ঘ) মূল্যায়ন :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। শিক্ষা বিস্তারে, নারীমুক্তি ও বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে বাংলার ইতিহাসে তিনি এক অনন্য আসনের অধিকারী। তাঁর মানবপ্রেম, হৃদয়বত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদাবোধ, বাস্তববোধ এবং আপসহীন সংগ্রামী মনোভাব চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এদিক থেকে সত্যই তিনি ছিলেন নবজাগরণের প্রতিমূর্তি। উনিশ শতকের মানুষ বিদ্যাসাগরকে সমকালীন নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছিল। এ কারণে এই যুগের অন্যান্য সংস্কারকদের মতো তাঁর চরিত্র ও কর্মে খুব বেশি না হলেও, কিছু স্ববিরোধিতা ছিল - যার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। (1) স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, তিনি কিন্তু নিজ স্ত্রী-কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। (2) বিধবা-বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি রূপ দেওয়ার জন্য তিনি প্রবল আগ্রহ দেখান, কিন্তু হিন্দু বিবাহের ত্রুটিগুলি সংস্কারের ব্যাপারে তাঁকে তেমন সক্রিয় দেখা যায় নি। (3) এক্ষেত্রে জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, কিন্তু [illegible] সরকারি উদ্যোগে স্বল্প ব্যয়ে বাংলাদেশে জনশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলেও তিনি তাতে আপত্তি জানান। এ কারণে অনেকে তাঁকে জনশিক্ষার বিরোধী বলে অভিহিত করেন। আসলে বাস্তবিক প্রয়োজনে ও জনশিক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই তিনি আপত্তি জানান। (4) মহিলাদের জন্য 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি আপত্তি জানান। এ ক্ষেত্রেও তাঁর যুক্তি ছিল বাস্তবসম্মত। এসত্ত্বেও সমকালীন বাংলার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :-

1. আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৭০৭-১৯৬৪ খ্রিঃ) — সিদ্ধার্থ গুহরায় এবং এস. চ্যাটার্জি, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগস্ট, ২০১৬, কলকাতা।
2. আধুনিক ভারত — জীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর পাবলিশার্স (১৭০৭-১৯৫০). কলকাতা, আগস্ট ২০০৪.
3. ভারতবর্ষের ইতিহাস — গোপাল চন্দ্র সিনহা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
4. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৭০৭-১৯৫০ খ্রীঃ) — প্রভাতাংশু মাইতি, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা.
5. ভারতবর্ষের ইতিহাস (1556-1947) - অতনু মুখোপাধ্যায় মিত্রম প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি 2012
6. আধুনিক ভারত পলাশী থেকে নেহরু (1757-1964) — সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রগতিশীল প্রকাশক।